যুগান্তর

25 MAR 2008

যুগান্তর

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়

সাফল্যে সেরা মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ঘিরে রমরমা ব্যবসা

মুসতাক আহমদ

এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ঈর্ষণীয় সাফল্যের কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে বোর্ডের শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় অত্যন্ত শক্তভাবেই অবস্থান ধরে রেখেছে রাজধানীর মিরপুরের মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৬৯ সালে মাত্র ৪৫ জন শিক্ষার্থী আর ১৩ জন শিক্ষকের মাধ্যমে জীর্ণ-শীর্ণ ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে যে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা, সময়ের পরিক্রমায় আজ তা প্রাসাদোপম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিন তিনটি শাখায় প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী বহুল পরিচিতি নিয়ে ঢাকায় অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মনিপুর-বড়বাগের কতিপয় শিক্ষানুরাগী মহৎ ও সৃজনশীল মানুষের প্রচেষ্টায় স্থানীয় দানবীর মরহুম নূর মোহাম্মদের স্মরণে ভিটায় প্রাথমিক বিদ্যালয়

আহাদ আলী

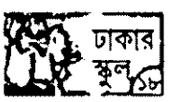

বিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

● কাল : মিল্লাত উচ্চ বিদ্যালয়

বিদ্যালয় : মনিপুর

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা করে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্কুলটির ওপর প্রকৃতি আর কিছু অসৎ মানুষের লোলুপ দৃষ্টি যেন লেগেই আছে। ধাপে ধাপে স্কুলটি এগিয়ে গেছে অনেকদূর। সাফল্য এর সঙ্গী। তবে ১৯৭১ সালে লুট হয়ে গিয়েছিল স্কুলের টিন-বেঞ্চ। ১৯৭৪ সালের প্রলয়ংকরী ঝড়ে প্রতিষ্ঠানটি সর্বস্বান্ত হয়। ১৯৭৮ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে যাত্রার আগ পর্যন্ত এলাকা ও এলাকার বাইরের মানুষের নিয়মিত মাসিক চাঁদায় এবং স্থানীয় কিছু শিক্ষিত ব্যক্তির স্বেচ্ছাশ্রমে (যারা অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন) প্রতিষ্ঠানটি চলত। বৃহত্তর মিরপুরে মানসম্পন্ন বিদ্যালয়ের খুবই অভাব। যে কারণে ঢাকার অন্যতম এ জনবহুল এলাকার সচেতন মানুষ তাদের সন্তানদের এ স্কুলে ভর্তির জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন। এ সুযোগ নিয়েছে স্কুলের একশ্রেণীর শিক্ষক আর গভর্নিং বডিতে শিক্ষানুরাগী সেজে থাকা স্বার্থান্বেষীরা। স্কুলকে ঘিরে চারপাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। স্কুল ড্রেস ও সহপাঠ্য নিয়েও হচ্ছে রমরমা ব্যবসা। নাম প্রকাশ না করে একজন অভিভাবক অভিযোগ করেন, এই সিন্ডিকেটের মধ্যে থাকা শিক্ষকদের একমাত্র কাজ ছাত্রছাত্রীদের কোচিংয়ে বাধ্য করা। ক্লাসে ঠিকমতো পাঠদানের পরিবর্তে কোচিংয়ের তাগিদ দিয়ে থাকেন তারা। এসব কোচিং সেন্টারে শিক্ষক ও তাদের আত্মীয়স্বজন ক্লাস নিয়ে থাকেন। এগুলোর বেশির ভাগের মালিকানা গভর্নিং বডির কোন না কোন সদস্য, শিক্ষক বা তাদের আত্মীয়রা। 'কোচিং না করলে পাস জোটে না'— এমনও অভিযোগ করেন একজন অভিভাবক।

শনিবার সরেজমিন স্কুলে গেলে এ অভিযোগের বিষয়টি কয়েকজন অভিভাবক বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করলেন সাবেক দুই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফিরিস্তি দিয়ে। স্কুলের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফিরিস্তি দেন এক অভিভাবক। আর এক অভিভাবক জানান, তাদের এক প্রকার জিম্মি করে রাখা হয়েছে। স্কুলে জরিমানা ব্যবসা হয়। অসুস্থতার কারণেও কেউ স্কুলে আসতে না পারলে মোটা অংকের জরিমানা গুনতে হয়। অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত দুর্ব্যবহার তো রয়েছেই।

অভিযোগ রয়েছে, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৪ লাখ টাকার সুবিধা নিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অননুমোদিত মোট ৪৮টি বই পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এসব বই স্কুলের সামনেই তিনটি লাইব্রেরি থেকে কিনতে হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। নাম প্রকাশ না করে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রের মা তার ছেলের ৮টি বই দেখিয়ে বললেন, দ্যাখেন— এইটুকু বাচ্চাকে ১১টি বই দেয়া হয়েছে। তিনটি বোর্ড বই। বাকিগুলো কিনতে হয়েছে।

এ প্রতিবেদক শনিবার দুপুরে স্কুলের বিভিন্ন ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আহাদ আলীর সঙ্গে কথা বলতে যান। কিন্তু সরেজমিন গিয়ে এবং টেলিফোনেও চেষ্টা করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তার অফিস সহকারীর কাছে 'কলতান' নামে স্কুলের একটি প্রকাশনা এবং 'নীতিমালা ও নির্দেশিকা' রেখে যান তিনি। ওই সহকারী এগুলো হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, এগুলো দেখে প্রতিবেদন লিখতে বলেছেন স্যার (প্রধান শিক্ষক)। স্কুলের মাধ্যমিক শাখার একজন শিক্ষক বলেন, সহপাঠ্য নিয়ে প্রধান শিক্ষক ঝামেলায় পড়ার পর থেকে তিনি সাংবাদিকদের ধরা দিচ্ছেন না।

স্কুলের দৃষ্টিনন্দন সাময়িকী 'কলতান' থেকে জানা যায়, স্কুলের মোট তিনটি শাখা আছে। এগুলো হচ্ছে— মূল বা বালিকা শাখা, বালক শাখা এবং ব্রাঞ্চ-১। মোট শিক্ষক ১৯২ জন। কর্মকর্তা-কর্মচারী ৭৩ জন। ৩য় থেকেই স্কুলটিতে সেমিস্টার পদ্ধতিতে লেখাপড়া হচ্ছে। ২০০৭ সালের এসএসসিতে পাসের হার ৯৯ দশমিক ২৯ ভাগ। মোট ৭০১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩১৪ জনই লাভ করেছে জিপিএ-৫। ১৯৭৫ সালে এই স্কুল থেকে এসএসসিতে শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। ১৯৮০ সালে ফাহমিদা ইয়াসমিন নামে এক ছাত্রী বাণিজ্য বিভাগে বোর্ডে মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান দখল করে সারাদেশে স্কুলের পরিচিতি ছড়িয়ে দেয়। সেই যে শুরু এরপর ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রায় বছরই ছাত্রছাত্রীরা মেধাতালিকায় স্থান করে নেয়। এর মধ্যে ১৯৮৮ সালে তৌহিদুল ইসলাম (সম্মিলিত ৮ম), মাসুদুর রহমান (সম্মিলিত ১৮তম) এবং আবু সাঈদ (সম্মিলিত ২০তম) নামে তিন ছাত্র মেধাতালিকায় স্থান করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৮৯, ৯০, ৯১ সালে এরই ধারাবাহিকতা চলে। ১৯৯২ সালে চার ছাত্রছাত্রী মেধাতালিকায় স্থান দখল করে। তৌহিদ মাহমুদ হোসেন (সম্মিলিত ৩য়), জাবু বকর (সম্মিলিত ৫ম), শফিউল আযম (সম্মিলিত ১৫তম) এবং ফারজিনা খানম (সম্মিলিত ১৫তম)। ১৯৯৫ এবং ১৯৯৮ সালেও চারজন করে মেধাতালিকায় স্থান দখল করে। ২০০১ সালে জিপিএ পদ্ধতি চালুর পর সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখে। ২০০৩ সালে স্কুল থেকে ৩৬ জন জিপিএ-৫ লাভ করে। ২০০৬ সালে ২৫৪ জন পেয়েছিল এই সাফল্য। স্কুলে সহশিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত চলে। ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা চর্চার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে, স্কুলের বার্ষিক প্রকাশনা 'কলতান'। এতে ছাত্রছাত্রীদের লেখা কবিতা, গল্প স্থান পায়।